# তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্বাচিত উপন্যাসে জীবিকাগত বৈচিত্র্য ও সংকট (১৯৩১-১৯৫০)

রাকেশ জানা

শোনা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর 'জনি ও টনি' গল্প পাঠ করে সাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তারাশঙ্করের সময়কালে সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজ ভাঙতে শুরু করেছে; তিনি এই সন্ধিকালটিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করেছেন। কালের এই গতিপথে তিনি দেখেছেন কিভাবে সামন্ত্রতান্ত্রিক সীমাবদ্ধ জীবনের স্বপ্ন, সংস্কার এক অনাহূত অতিথিরূপে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দখলদারিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নগরায়ণের দ্রুত বিস্তারের ফলে যন্ত্রশিল্পের প্রতি মানুষের নির্ভরতা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ও অস্থিরচিত্ত, হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট মূল্যবোধজনিত বিপর্যয়, ব্যক্তিত্বের সংকট, বিচ্ছিন্নতাবোধ কৃষি অর্থনীতির বিপর্যস্ত অবস্থা কারখানায় শ্রমিক শোষণ ও তার বিরুদ্ধে শ্রমিক সাধারণের কর্ম-বিরতি হরতাল প্রভৃতি সব দিক থেকে মানুষকে রিক্ত করেছিলো। বাঙালির মন ও মননে তখন প্রবেশ করেছিল স্বাধীনতার আহ্বান; তারই ফল স্বরূপ অসহযোগ আন্দোলন সাম্যবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ। ব্রিটিশ বিরুদ্ধাচারী সশস্ত্র সংগ্রাম ও অহিংস্র আন্দোলন এই দু'ধারাই নিজ নিজ পথে বহমান ছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় দ্রব্যের অকারণ মজুতদারীতে ও প্রকৃতির বিপর্যয়ের হেতু স্বরূপ পঞ্চাশের মন্বন্তর সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে (ঝড় ও ঝরাপাতা, মন্বন্তর প্রভৃতি) নগরাঞ্চলের এই অবস্থার উল্লেখ থাকলেও তাঁর রচনার মূল পটভূমি গ্রাম সমাজকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠিত। বীরভূমের গ্রামাঞ্চলের উদ্দাম, অসংস্কৃত জীবনধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। অসীম রায় তাঁর 'তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বলেছেন - "তাঁর গ্রাম শহর-ফেরতা শৌখীন যুবকের বিচরণের আশ্রয়ভূমি নয়, শ্যামল কোমল জলে ভরা কাঁদো কাঁদো সিচুয়েশনের সমষ্টি নয়। তাঁর গ্রাম প্রকৃতই গ্রাম যেখানে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ বাস করে। এই কামার-কুমোর-চাষী-বেদে বেদিনীর গ্রামে আমরা আগে বাংলা সাহিত্যে দেখিনি। এবং এই দেখা তিনি বেঁধেছেন এক অখন্ড জীবনবোধে"[১]। ঠিক একই বক্তব্যের অনুরণন পূর্বে শোনা গেছে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য' গ্রন্থে। তবে তাঁর

উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী ও অনুপস্থিত নয়। তবে তাঁর উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি ভিড় করে রয়েছে বীরভূমের আঞ্চলিক নিম্নবৃত্তিজীবী উপেক্ষিত জনজীবন। তারাশঙ্কর গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমাজ চেতনার রূপটি তাঁর সাহিত্যে দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মচেতনা, উৎসব, আচার অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ প্রভৃতি সব দিকে তাঁর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি সজাগ ছিল। পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা তাঁর রচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারাশঙ্করের স্বগ্রাম বীরভূমের লাভপুর ও তার চারপাশের বিস্তৃত অঞ্চল সমূহ তাঁর সাহিত্যের পটভূমি রচনায় সহায়ক হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ মাটি, এই অঞ্চলের জলহাওয়া, এখানকার জনমানবের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবন তাঁর রচনাকে আঞ্চলিকত্ব প্রদান করেছে। তা যাই হোক আলোচ্য নিবন্ধে উল্লেখিত সময়কালে আমরা নির্বাচিত তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলিতে জীবিকাগত বৈচিত্র্য ও সংকট আলোচনায় প্রবৃত্ত হব

তাঁর 'আগুন' উপন্যাস সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ 'কালপুরুষ' নামে প্রকাশিত হয় - ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৯ই শ্রাবণ থেকে ২১শে কার্তিক পর্যন্ত। পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে, তখন তার নাম বদলে রাখা হয় 'আগুন'। জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় তারাশঙ্কর রচনাবলীর পঞ্চমখন্ডের ভূমিকা অংশে আলোচ্য উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন - ''আগুন উপন্যাসে এই প্রবৃত্তিরূপিনী জীবনবহ্নিরই বিচিত্র আলেখ্য রচিত। ধর্মবহ্নি, কামবহ্নি ও যশোবহ্নি — এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তিবহ্নিরই তাড়নায় প্ররোচিত বিড়ম্বিত ও উৎপীড়িত তিনটি চরিত্র আগুন উপন্যাসের অবলম্বন''[1]। এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তির মধ্যে তিনি ধর্মবহ্নি দ্বারা চালিত চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথবাবুর কথা বলেছেন। এই উপন্যাসে কামবহ্নি প্রসঙ্গে জগদীশবাবু ধনীর সন্তান হীরুর কথা বলেছেন। এই হীরু এক যাযাবরী মুক্তকেশীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এখানে তারাশঙ্কর বীরভূমের যাযাবর সম্প্রদায় বাজিকরদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। বীরভূমের গাজন উৎসবকে কেন্দ্র কর এই বাজিকর সম্প্রদায়রা নানা কলা-কৌশল দেখিয়ে থাকে — ''...এই জাতিটি আমার চিরদিনের বিস্ময়। যাযাবর জাতি, ভাঙাচোরা ঘরগুলি পিছনে ফেলিয়া বেশাখেই দেশদেশান্তরে চলিয়া যাইবে, বর্ষায় ভাঙা ঘর ভূমিসাৎ হইবে, আবার ফিরিয়া নতুন ঘর তুলিবে। সে ঘরও আবার ভাঙে, আবার উহারা নূতন গড়ে। এই শিব, এই গাজন ওই বাজিকরদেরই নিজস্ব। পুরুষ দেখায় ভেল্কিবাজি, নারীরা সাপ বাঁদর লইয়া নাচায়, নিজেরাও নাচে — নাগিনী নৃত্য। অপূর্ব সে নৃত্য স্থির চরণে দেহ হিল্লোলিত করিয়া, সে নৃত্যের নাম নাগিনী নৃত্য ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না''[2]। তারাশঙ্করের অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পে এই যাযাবরী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আলোচিত রয়েছে।

তা যাই হোক আলোচ্য 'আগুন' উপন্যাসে যাযাবরী মুক্তকেশীর রূপযৌবনের দীপশিখায় আকৃষ্ট হয়ে সভ্যসমাজের অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে দ্বিধালজ্জাহীন-উলঙ্গ-বর্বর কামনায় মেতে ওঠে। তারা সাঁওতাল পরগনার আদিম অরণ্যভূমিতে আশ্রয় নেয়। অতঃপর কামনায় অবসাদ আসে। মুক্তকেশী তখন হীরুর অবাঞ্ছিত সন্তানের জননী হতে চলেছে। এই সংবাদে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র পুরুষ হীরু আত্মমর্যাদাবোধে অবাঞ্ছিত সন্তানে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু মুক্তকেশী এই নিষ্ঠুর সত্য অনুভব করে সন্তানকে বাঁচাতে হীরুর আশ্রয় থেকে পালিয়ে যায়। "অসংবৃত ভোগলিপ্সা পুরুষের জীবনকে যে অনিবার্য বিনাশের পথে টেনে নিয়ে যায় হীরুর অন্তিম পরিণতির মধ্যে দিয়ে তারই প্রকাশ ঘটেছে। ... ক্ষয়রোগকে বুকে নিয়ে প্রবৃত্তিরূপিণী নিয়তির শিকার হয়েছে সে"[৪]।

আলোচ্য 'আগুন' উপন্যাসের ত্রিবিধ প্রবৃত্তিবহ্নির মধ্যে যশোবহ্নির দ্বারা চালিত হয়েছে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চন্দ্রনাথ। ইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় অন্যায়ভাবে ধনীর সন্তান হীরুকে প্রথম ও তাকে দ্বিতীয় করা হয় বলে এই অভিযোগ এনে, চন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে পত্র লিখে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে। এই নিয়ে তার দাদা নিশানাথের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে সে গৃহত্যাগ করে বৃহত্তর পৃথিবীর পথে পা বাড়ায়। জগদীশ বাবু ভূমিকা অংশে বলেছেন, - "যে প্রেরণা চন্দ্রনাথকে অনুক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাকে আমরা বলেছি যশোবহ্নি। তাকে আত্মাভিমান বা উচ্চাকাঙ্খা বা প্রতিষ্ঠালিপ্সাও বলা যেতে পারে। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় চন্দ্রনাথ একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, মুহূর্তের জন্য বিশ্রামও গ্রহণ করল না"[৫]। তাই তাঁর চন্দ্রনাথ চরিত্র, যে কোন বাঙালিকে বৃহত্তর কর্মে প্রতিষ্ঠা লাভের নেশায় উদ্দীপিত করবে বলে মনে হয়। কিভাবে একদম শূন্য থেকে শুরু করে শুধুমাত্র মেধা ও কর্মের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা রেখে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি করা যেতে পারে — চন্দ্রনাথ তার বড় প্রমাণ। কিন্তু এই প্রচণ্ড যশোলিপ্সা তার সংসার জীবনের সুখশান্তি কেড়ে নেয়, নিজের স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। এই মাত্রাতিরিক্ত যশোলিপ্সার নেশায় সে ঋণ করে সর্বস্ব খোয়ায়। তবুও তার যশোলিপ্সার নেশাকে সে পরিত্যাগ করতে পারে না, এখানেই চন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি।

চন্দ্রনাথ গৃহত্যাগের পর গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বর্ধমান, মানভূম, হাজারিবাগ পেরিয়ে সুবর্ণরেখার তীরে এসে পৌঁছায়। ওখানে সে জামসেদজী টাটার ব্লাস্ট-ফারনেসের শিখার দীপ্তিতে বিস্ময়াবিভূত হয়, ওখানে কাজ নেয়। তারপর সাহস ও বুদ্ধির জোরে চাকরিতে তার পদোন্নতি ঘটল। কিন্তু কিছুদিন পর যুদ্ধের

জন্য বাঙালি পল্টনে সৈন্য নেওয়া শুরু হয়েছে। তাই কারখানার চাকরি ছেড়ে সে হল মহাযুদ্ধের সৈনিক। কিন্তু এখানে তার এই সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার স্বপ্ন আঘাতপ্রাপ্ত হয়। চন্দ্রনাথ বলেছে — "ফিল্ডে গিয়ে আবার আঘাত পেলাম। সেখানে দেখলাম, ওপরে ওঠবার পথ নেই। কালো রঙের আমাদের স্থান চিরদিন নীচে, বরফের মতো আমাদের মাথায় চেপে থাকবার কায়েমী আসন সাদা জাতের"[৬]। আসলে সে সময় সব রকমের চাকরির পদোন্নতির ক্ষেত্রে সাদা চামড়ার বর্ণের প্রতি পক্ষপাত প্রচলিত ছিল; এ অবস্থা সেই অব্যবস্থার বর্ণনা দেয়। এখানে সেনা থাকাকালীন চন্দ্রনাথ অসহায় সৈনিকের ওপর তার ঊর্ধ্বতণ সেনানায়কের অত্যাচারও লক্ষ্য করেছিলো। যা তাকে যুদ্ধশেষে সৈনিকের চাকরি ছেড়ে শান্তিকামী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার মনোবাসনা জুগিয়েছিল। তাই যুদ্ধশেষে সন্ন্যাসী-রূপে সারা ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করতে করতে সে এক তীর্থের মেলায় এসে হাজির হয়। এখানে এক রক্তরাঙা লাল শাড়ির বর্ণচ্ছটায় বিভ্রান্ত হয়ে সে তার হাতের পুরোনো ছড়িগাছিটি হারিয়ে ফেলে। এই ছড়িগাছির সন্ধানে সে ওই রক্তরাঙা লাল শাড়ি পরিহিতা মীরা দেবীর সাথে পরিচিত হয়। তার বাবা আগ্রা কলেজের অধ্যাপক। এখানেই মীরা ও চন্দ্রনাথের ভালোবাসার সূত্রপাত। এরপর বাড়ির অমতে মীরা চন্দ্রনাথকে বিয়ে করে; তবে বিবাহের পূর্বে চন্দ্রনাথ শিখধর্ম গ্রহণ করে পাঞ্জাবী হয়। এরপর চন্দ্রনাথ কানপুরে একটি কারখানা গড়ে তোলে। এই কারখানার শ্রীবৃদ্ধি তাকে উচ্চভিলাসী করে তোলে। সে ওই কারখানা বেচে মানভূমে 'চন্দ্রপুরা ফায়ার ব্রিকস এণ্ড পটারীজ ওয়ার্কস' গড়ে তোলে। ক্রমে 'গ্রোথ অব দি সয়েল' - এর নেশা তাকে পেয়ে বসে। কারখানা আরো বাড়াতে সে মহাজনের কাছে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ করে। চন্দ্রনাথ জানে এই ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে শুধুমাত্র দেনার দায়ে কারখানার মালিকানা হস্তান্তর হবে; কিন্তু সৃষ্টির সম্প্রসারণ বন্ধ হবে না। তাই এই অতিরিক্ত ঝুঁকিতে সে সর্বস্ব হারায়। অবশেষে কলকাতায় সামান্য পুঁজি নিয়ে এসে শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটায়। তার ইচ্ছে এই শেয়ার মার্কেটে প্রতিনিয়ত নজরদারির মাধ্যমে টাকা খাটিয়ে আবার 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা। এই আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী পুরুষের দুর্দমনীয়-অনমনীয় মনোভাবে তার জীবনে নানা বাধা-বিপত্তি নেমেছে - স্ত্রী মীরার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, সম্পত্তি খুইয়েছে; তবুও যশোলিপ্সার স্বপ্নকে সে হারিয়ে ফেলেনি।

এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তিরূপিণী জীবনবহ্নিকে যে তার স্মৃতিচারণায় অমর করে গড়ে তুলেছেন তিনি হলেন উপন্যাসের কাহিনী কথক নরেশ মুখোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্করের

দ্বিতীয় সত্ত্বা'; যিনি সাহিত্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর দুই সহপাঠী ছিলেন হীরু ও চন্দ্রনাথ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে আলোচ্য উপন্যাসের খসড়া নির্মাণের সৃষ্টি-সূত্র দিয়ে বলেছেন - "...'আগুনে'-র খসড়া তৈরি করেছিলাম বেহার প্রদেশের মগমা নামক স্থানে; বেহার ফায়ার ব্রিকস কারখানায় - আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাসায়"[৭]।

তারাশঙ্করের সাহিত্য নগর জীবন নিয়ে প্রথম লেখা উপন্যাস হল 'মন্বন্তর'। এতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন মহানগরী কলিকাতার' নাগরিক জনজীবনের দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। এই মন্বন্তরের কালসীমা ছিল ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মার্চ পর্যন্ত। মন্বন্তর উপন্যাসটি ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই উপন্যাসটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে 'মন্বন্তর' বলতে তারাশঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষকেই চিহ্নিত করেছেন। আর এই দুর্ভিক্ষ ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই। উপন্যাসে দেখা গেছে কিভাবে বিশ্বযুদ্ধের সুবিধাভোগ করে মজুতদারেরা কালোবাজারিতে প্রচুর অর্থ কামিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও অভাব সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কানাইয়ের বক্তৃতায় শোনা গেছে কিভাবে খাদ্যের সন্ধানে মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ কলকাতায় ভিড় বাড়াচ্ছে। বর্ধমান জেলার গ্রাম থেকে ভিক্ষা করতে শহরে আসা ডুবকী যন্ত্র হাতে গায়ক ছেলেটির গানে আসন্ন যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের রূপ বর্ণিত হয়েছে। অথচ শহরে পালিয়ে আসা এই গ্রাম্য মানুষদের ঘরদোর জমি সব ছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রকোপে চালের দরে আগুন লাগলে এদের ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। উপন্যাসের নায়ক কানাইয়ের চোখে এদের বর্তমান অবস্থা বর্ণিত হয়েছে- "...ওপাশে ফুটপাথে বসে আছে নিরন্ন গৃহহীনের দল — ভিক্ষা ওদের পেশা নয়, কিন্তু ওরা আজ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে"[৮]।

আলোচ্য উপন্যাসে কানাইয়ের পরিবার পূর্বে কলকাতায় বিত্ত ও ঐশ্বর্যের শিখরে অবস্থান করতো। কানাইয়ের প্রপিতামহ সুখময় চক্রবর্তী এই চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কলকাতায় পঞ্চাশ বিঘা জমি কিনে তাতে বস্তি গড়ে ভাড়াটে ব্যবসা শুরু করেন। এই ভাড়াটে ব্যবসায় তিনি প্রকাণ্ড দোমহলা বাড়ি নির্মাণ করেন এছাড়া ব্যাঙ্কেও লক্ষাধিক টাকা রেখে যান। সেই টাকা তাঁর উত্তরপুরুষ ধরে অনাবশ্যক খরচ হয়ে আসতে থাকে। শোনা যায় সুখময় চক্রবর্তীর তিন ছেলে

তাস-পাশা খেলে, রেসকোর্সে গিয়ে ঘোড় দৌড়ে জুয়া খেলে, মদ্যপান করে, বাড়িতে নিয়মিত বাইজী নাচিয়ে, আজ ঘোড়া কিনে পরদিন সেটা বেচে নতুন ঘোড়া কিনে চরম সংযমহীনতায় কালযাপন করে আজ দারিদ্র্যের করালগ্রাসে ধুঁকছে। তাঁদের বর্তমান অবস্থায় জীর্ণতা প্রকাশ পেলেও বনেদিয়ানার দাম্ভিকতা লুপ্ত হয় না। তাছাড়া শরীরের প্রতি চরম অনাচার ও ব্যভিচারে এই বংশের উন্মাদনা ও ব্যাধি নিত্যসঙ্গী। পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করতে গিয়ে এদের বংশের শিশুদের সূতিকাগৃহে মৃত্যু হয়, নয় তো কঙ্কালসার, কুঞ্চিতলোলচর্ম হয়ে হাঁপানি রোগীর মত শ্বাসকষ্টের ব্যাধি নিয়ে বেঁচে থাকে। এই অভিশপ্ত বংশে একমাত্র কানাই-ই সুস্থ ও স্বাভাবিক দেহ নিয়ে বেড়ে উঠেছে। সে বি-এস-সি পাশ করে টিউশনির টাকায় সংসার ও নিজের খরচ দুই চালায়। তার টিউশনির ছাত্র হল একালের ধনী ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর বি বি মুখার্জির ছোট ছেলে। ছেলেটি পরীক্ষায় ভালো ফল করায় তিনি কানাইকে একশ টাকা পুরস্কার দেন। পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয় একগুচ্ছ প্রপোজাল- "আপনি ব্যবসা করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। মানে ধারে মাল দেব, -চাল, চিনি, আটা। আজ চালের দর জানেন? চৌদ্দ টাকা। কাল হয়ত ষোলয় উঠে যাবে। আজ কিনে কাল যদি বেচেন— তাও মণকরা দুটাকা থাকবে আপনার। দৈনিক পঞ্চাশ মণ চাল যদি আপনি কেনাবেচা করতে পারেন, তবে দৈনিক একশো টাকা, মাসে তিন হাজার টাকা, -বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা লাভ হবে আপনার"[১]। তা যাই হোক পুরস্কারের পাওয়া একশ টাকাকে কেন্দ্র করে কানাইয়ের পরিবারে আত্মসর্বস্ব, ভোগাড়ম্বরের চরম নির্লজ্জতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবারের এই অর্থ লোলুপতা ও নৈন্যদশা আশ্চর্য দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। পরিবারের এই রূপ আত্মসর্বস্ব, ভোগাড়ম্বরের বনেদীয়ানায় আহত কানাই শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করে।

কানাই গৃহত্যাগের দিনেই বোন উমার বন্ধু গীতাকে অপমান ও আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করে কাগজের সম্পাদক বন্ধু বিজয়দার বাসায় গিয়ে ওঠে। এতে পাড়ায় গীতার নামের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কুৎসা রটে। গীতা কানাইয়ের প্রতিবেশী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের সন্তান। প্রদ্যোত বাবুর পিতামহ যজমানি করলেও তাঁর পিতা সামান্য ইংরাজী শিখে সওদাগরী অফিসে কাজ জুটিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদ্যোৎ-এর পিতা তাকে স্বাধীন ব্যবসা অথবা দালালিতে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। — "তখন বাঙালি ধনীরা চেয়ার টেবিল নিয়ে সবে অফিস ফাঁদতে শুরু করেছে। মূলধনের অভাবে প্রদ্যোতের বাপ দালালিটাকেই ভালো বলে মনে করেছিল। নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সে বেশ বুঝেছিল যে, দেওয়া এবং নেওয়ার মাঝখানে

হাত পেতে দাঁড়াতে পারলে সে হাতে দাতা-গ্রহীতা দু-তরফ থেকেই কিছু কিছু ঝরে পড়তে বাধ্য। দালালদের কমিশন এবং সেল পারচেজ অর্থাৎ কেনা-বেচা ব্যবসায়ের লাভ দেখে সে ছেলেকে দালালিতে দীক্ষা দিতে চেয়েছিল। দালালির অন্যতম প্রধান মূলধন মুখ, অর্থাৎ কথা বলে মানুষকে মুগ্ধ করা, সেটা প্রদ্যোতের ছিল"[১০]। তাই দালালিতে সে সার্থকতা লাভ করে। পরে দালালি থেকে 'সেল-পারচেজ বিজনেস' শুরু করে। "তারপর একদা, ব্যবসায়-বুদ্ধিতে পরিপক্কতা লাভ করে - বাজারের দেনা ফাঁকি দিয়ে বাজারের পাওনাটা সমস্ত গ্রাসের প্রত্যাশায় ইনসলভেন্সি ফাইল করে — পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে স্ত্রীর নামে কলকাতায় তুললে শৌখিন বাড়ি..."[১১]। কিন্তু মামলার বিচারে তাঁর ভুল বেরিয়ে পড়লে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স শেষ হয়। স্ত্রীর নামে থাকা বাড়িঘরও বিক্রি করতে হয়। তারপর একটা চাকরি অবশ্য তাঁর জুটেছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ব্যবসার বাজারে বিপর্যয় ঘটলে সেই চাকরি থেকে তাঁকে ছাঁটাই করা হয়। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়ে অসুস্থ দেহে তিনি চক্রবর্তী বাড়ি সংলগ্ন বস্তিতে এসে আশ্রয় নেন। এই প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের সংসারে স্ত্রী সরোজিনী ছাড়া পুত্র হীরেন ও কন্যা গীতাকে নিয়ে একপ্রকার দেনা করেই সংসার চলছিল। এই প্রায় দেউলে হওয়া সংসারে সর্বনাশের দূত হয়ে এলো এক ঘটকী বামুনদিদি। যিনি সব দেনা পরিশোধ করার আশ্বাস দিয়ে গীতাকে এক ধনী সন্তানের ভোগ-লালসা চরিতার্থতার জন্য অর্পণ করেন। যুদ্ধের সময় মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে নারী পাচারের ব্যবসা রমরমিয়ে চলে। যার দালাল হন বামুনদিদির মতো ব্যক্তিরা। যার বাইরে পরিচয় ঘটকী, কিন্তু ভেতরে সে বাবা-মায়ে অসহায়তার সুযোগে কুমারী মেয়ে কিনে; গোপনে দেহব্যবসা চালায়। মন্বন্তরে সৃষ্ট অর্থ ও খাদ্যের অভাববোধ — মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যায় যার বড় প্রমাণ গীতার বাবা-মা। তাইতো বামুনদিদির হাতে মেয়েকে অর্পণ করার পূর্বে মা সরোজিনী গীতাকে তার অসহায়তার কথা শোনায় - "বামুনদিদি যা বলবে, তাই শুনিস না। তোর দৌলতে যদি দুটো খেতে পরতে পাই; নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে"[১২]। গীতাও পরিবারের কথা ভেবে একপ্রকার বাধ্য হয় বামুনদিদির কথা মানতে; যার ফল স্বরূপ সে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। সমাজে তার এই লাঞ্ছনা প্রকাশ পেলে সম্মানহানির ভয় তাকে আত্মহত্যার পথ দেখায়। কিন্তু কানাইয়ের দরদী মনোভাবে সে আবার বাঁচার পথ খুঁজে পায়। বিজয়দার পরামর্শে নিজেকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করতে সে নার্সিং স্কুলে ভর্তি হয়। যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট অর্থ ও খাদ্যের অভাববোধ মানুষকে হীনবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছে। গীতার ভাই হীরেন চূড়ান্ত অভাবে অপরাধ জগতে পা বাড়ায়। তার বেরোজগেরে অবস্থায় পিতা-মাতার কটাক্ষ ও দিদির নামে কলঙ্ক রটনা; তার মনের

শুভ বোধগুলি নষ্ট করে। অভিভাবকত্বহীনতায় তার দিনগুলি অতিবাহিত হওয়ায় ভালো-মন্দের তফাত বুঝতে পারে না। প্রথম প্রথম বাড়ি থেকে চুরি করা অর্থে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে তার নিজের হাত খরচ চলতো। তাছাড়াও এই যুদ্ধের সময় সে অন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করেছিল টাকা রোজগারের - "আজকাল সরকারের নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি অনুযায়ী চিনি বিক্রি হয়- মাত্র কয়েকটি দোকানের সামনে 'কিউ' করে লোক দাঁড়ায়; সেই 'কিউ'-এ দাঁড়িয়ে হীরেন কন্ট্রোলের দরে চিনি কিনে চড়া দামে বেচে দেয় চায়ের দোকানে। শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত তার এলাকা"[১৩]। গীতা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সে বাড়িতে বাবা-মার সাথে ঝগড়া করে, সব সম্পর্ক ত্যাগ করে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। "উপার্জনের বহু পন্থা সে জানে, আরও বহুতর পন্থার কথা সে শুনেছে। অন্ধকার গলিতে দুর্বলের কাছ থেকে তার যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়া যায়; লোককে ঠকিয়ে উপার্জন করা যায়; যে পল্লীতে অবাধে চলে ব্যভিচার, সে পল্লিতে গলিগুঁজি চিনে বাবুদের পথ দেখাতে পারলে, গভীর রাত্রে গোপন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মদ এনে দিতে পারলে টাকা মেলে"[১৪]। আবার আলোচ্য উপন্যাসে কানাই তাকে সিনেমা হলে চা বিক্রি করতেও দেখে। জাপানি বোমার আঘাতে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। তা যাই হোক গীতা ও হীরেনের গৃহত্যাগের পর প্রদ্যোৎ বাবুর পরিবারে দুর্যোগ নেমে আসে। চরম খাদ্যাভাবের সংকটলগ্নে গীতার মা বামুন দিদির পরামর্শে সধবা অবস্থাতেই সিঁদুর মুছে বিধবা ভিক্ষার্থিনী সেজেছে। কারণ — "শুধু শুধু ভিক্ষে কি লোকে দেয়। দুঃখের কথা বলতে হয়; ভিক্ষে করতে গেলে মিছে করেও বলতে হয়"[১৫]। উদরান্নের তাড়নায় মানুষের এভাবে শুভবুদ্ধি হারিয়ে নৈতিকতার বিপর্যয় চরম অবক্ষয়লগ্ন।

আলোচ্য উপন্যাসে আদর্শবাদী ওকালতি ব্যবসায়ী দেবপ্রসাদ সেন-এর পরিবারও এই মন্বন্তরের শিকার। দর্শনশাস্ত্রে এম এ পাশ করে আইন পড়ে ওকালতি করলেও আদর্শবাদের সঙ্গে ওকালতিকে কখনো মেলাতে পারেন নি দেবপ্রসাদ। তাই ওকালতিতে তাঁর প্রসার সেভাবে ঘটেনি তবে জীবনে আদর্শবাদকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই আঁকড়ে ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে অমর "এম.এ পাশ করে বি.সি.এস থেকে আরম্ভ করে নানা চাকরির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে নিয়ছিল পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে স্কুলমাস্টারি"[১৬]। তবে যুদ্ধের দরুণ স্কুলের দুরবস্থায় তাঁর মাইনে পঁয়ত্রিশে এসে ঠেকেছে। দেবপ্রসাদের নিজের উপার্জনও এই যুদ্ধের বাজারে নাম মাত্র। যুদ্ধের এই ক'মাস তিনি লক্ষ্য করেছেন— "...সাধারণ শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে এসেছে যে ধর্মাধিকরণের মারফতে আপনার ন্যায়সংগত অধিকার বা প্রাপ্য

আদায় করবার জন্য যেটুকু প্রাথমিক খরচে প্রয়োজন, তাও তাঁদের জোটে না। কয়েকজন বাড়িওয়ালা মক্কেল তাঁর আছে; তাদের বাড়িভাড়া আদায় বা ভাড়াটে বিতাড়নের মামলা প্রায় লেগেই থাকত। কিন্তু ইভাকুয়েশনের হিড়িকে কলকাতায় বাড়িওয়ালারা বাড়িভাড়া আদায়ের জন্য মামলা দূরে থাক, ভাড়াটেদের কড়া তাগাদা পর্যন্ত করে না"[১৭]। তাই বর্তমানে তিনি ওকালতি একপ্রকার বন্ধ করে উপার্জনহীন হয়ে ঘরেই বসে আছেন। তাঁর আর দুই সন্তানের মধ্যে মেয়ে নীলা স্কটিশ থেকে বি.এ. পাশ করে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিয়েছে। আর ছোট ছেলে নেপী বি.এস.সি পড়তে পড়তে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী রূপে রাজনীতিতে ব্যস্ত। এজন্য নেপীকে মাঝে মাঝে ঘর-সংসারের মায়া ও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দেশের দুস্থ, পীড়িত, আর্তদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে দেখা গেছে। যুদ্ধের তীব্রতা যত বাড়তে থাকে দেবপ্রসাদের সংসার নির্বাহ তত কঠিন হয়ে পড়ে। এদিকে বড়ছেলে অমরের মাস্টারিও চলে যায়। কলকাতায় বিমান হামলায় বোমা পড়লে, দেবপ্রসাদ নীলা ও নেপীর খোঁজ নিতে গিয়ে থিয়েটারহলে নীলার সঙ্গে ব্রিটিশ সৈনিক স্টুয়ার্ট ও ম্যাকেঞ্জিকে দেখে নীলাকে ভুল বোঝেন। নীলার প্রতি সন্দেহে দেবপ্রসাদ নীলাকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করলে, নীলা ও নেপী ঘর ছেড়ে বিজয়দার আশ্রয়ে চলে যায়। তিনি এই দুঃসময়ে অমরকে স্বগ্রামে গিয়ে চাষবাস করার নির্দেশ দেন। একমময় যে দেবপ্রসাদ স্ত্রীশিক্ষাকে সংসারে ও নারী-জীবনে অপরিহার্য বলে মনে করতেন; তিনি নীলার চরম আঘাতে আদর্শবাদের জলাঞ্জলি দিয়ে চরম রক্ষণশীল হয়ে পড়েন। অমরকে নির্দেশ দেন বাড়ির মেয়েদের স্কুলে না পাঠাতে। তাঁর আদর্শবাদের মৃত্যু হয়। শেষপর্যন্ত নীলা ও নেপীকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে চরম হতাশায় তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

কানাই যখন গৃহ ত্যাগ করে তখন ছাত্র অশোকের বাবা বি. মুখার্জীর পরামর্শে ও সহায়তায় সে আড়তদারী ব্যবসায় নামে। অর্থাগমের সুলভ পথে তার চোখে ধাঁধা লাগে, এক সুখাবেশের কল্পনা মিশ্রিত উত্তেজনায় সে আচ্ছন্ন থাকে। তার চোখে তখন ক্ষয়প্রাপ্ত বিনষ্ট পূর্বপুরুষের পুনরায় স্বমহিমায় উত্থানের ঘোর লাগে। এখানে সে মজুতদারী ও কালোবাজারীর প্রকৃত চিত্র দেখতে পায়। ছাত্র অশোকের মুখের কথায় এর সত্যতাকে উপলব্ধি করে - "বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন - আমাদের গুদামের চাবি যদি একসপ্তাহ খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আট দিনের দিন বাংলাদেশে উনোন জ্বলবে না"[১৮]। কানাই বি. মুখার্জির বড়ছেলে অমলাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে কিভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদাম ঘরে মজুত করে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এখানে আরো দেখতে পায় কিভাবে

চড়াবাজারের সুবিধা নিয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাজড়িত কলকারখানায় মানুষকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে একপ্রকার বাধ্য করা হয় কলকারখানায় যোগদান করতে। সেখানে বন্দী শ্রমিকদের দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থায় সে শিউরে উঠেছে। অমলবাবুদের সাথে কালোবাজারীর সুবাদে সে এই ব্যবসাদার শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আধিপত্য লক্ষ্য করেছে। দেখেছে কীভাবে কতসহজে অর্থের কাছে বিক্রি হচ্ছে মানুষের শ্রমশক্তি ও উৎপাদনশীলতা। সেই সাথে অর্থের সর্বগ্রাসী ক্ষমতায় নারীর মর্যাদাও হরণ করা হচ্ছে। এভাবে গীতার সর্বনাশের কারণ অমলবাবুকে চিনতে পেরে সে ওই পাপ সংসর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। সে এরপর বিজয়বাবুদেরই দৈনিক সংবাদপত্র 'স্বাধীনতা'-র নাইট সাবএডিটর হিসেবে চাকরিতে নিযুক্ত হয়। এই পত্রিকাতে কানাই অমল বাবুর মতো কালোবাজারীর মজুতদারের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখে, ক্ষমাহীন ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এতে "পুঁজিবাদীদের দয়ার অন্তরালে যে গোপন কূট মনোভাব খেলা করে সেইটাই সে প্রকাশ করেছে"[১৯]। যদিও এই উপন্যাসে ব্যভিচারী অমলবাবুর প্রতি কানাইয়ের নায়কোচিত প্রতিহিংসার অভাব লক্ষ্য করে অনেকে হতাশ হন। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হয় কানাইয়ের অমলবাবুর বিরুদ্ধে পত্রিকাতে প্রতিবাদের ভাষা নায়কোচিত না হয়েও বিচক্ষণ ও স্থির মস্তিষ্কের পরিচয়বাহী।

কানাইয়ের এই প্রবন্ধ সর্বত্র প্রশংসা পায়। বিজয় বাবু অন্যান্য সংবাদপত্রেও এই প্রবন্ধ দেওয়ার অনুরোধ করেন। একই লেখাকে ভাষা ব্যবহারের চাতুর্যের দ্বারা কীভাবে মনোরঞ্জক করতে হয় তার কিছু ট্যাকটিক্স শিখিয়ে দেন বিজয় বাবু- "...জার্নালিজমের প্রথম ও প্রধান ট্যাকটিক্স - এক মুরগি পাঁচ দরায় জবাই করবার কৌশল। সে আমি তোকে তিন দিনে তালিম দিয়ে দেব। দ্বিতীয় ট্যাকটিক্স হল - পরের প্রবন্ধ এমন কৌশলে আত্মস্মাৎ করতে হবে যে, যেন মূল লেখক আইডেন্টিফাই পর্যন্ত করতে না পারে এবং তার চেয়ে অনেক বেশি ঝাঁঝালো হয়। থার্ড ট্যাকটিক্স হল প্রতিবাদে গাল দেওয়া একেবারে রাম গালাগাল। আর বাংলাতে যখন প্রবন্ধ লিখবি, তখন মহাকাল-টহাকাল একটু লাগিয়ে দিবি। তাণ্ডবনৃত্য, দিগবসনা, লোলজিহ্বা- এইরকম কতকগুলো কথা ব্যবহার করা অভ্যেস করে ফেল"[২০]।

এই উপন্যাসের অন্যতম বক্তব্য হল একদা ধনী পচনশীল গৃহের পতন। উপন্যাসে কানাইয়ের পরিবার শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের আঘাতে শেষ হয়ে যায়। এই বোমাভীতিতে সে সময় অনেক কলকাতাবাসী কলকাতা ছেড়ে নিজের জন্মভূমি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলো; পানব্যবসায়ী শিউচরণ তাই চালু ব্যবসা ছেড়ে দেশে চলে যায়। যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট মন্বন্তরে নীলা ধর্মতলায় ফুটপাতে অজস্র

জুতোপালিশের কাজে প্রবৃত্ত বালককে দেখে যাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য সব সম্প্রদায়ের বালকই ছিল। আলোচ্য উপন্যাসের এই অংশের অবতারণায় মন্বন্তরের ফলে সৃষ্ট সমাজের হতদরিদ্র অবস্থার কথা উল্লেখিত হয়, যা শ্রেণীভিত্তিক সমাজকে এক স্তরে নিয়ে এসেছে। এটা প্রবল দারিদ্র্যের চাপে সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের হঠাৎ বিপর্যয় মাত্র। "বর্ণাশ্রম' ধর্মের অপঘাত সমাপ্তি বোধকরি এই মহাযুদ্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল"[২১] - লেখকের এ কথা বোধ হয় সামাজিক সত্য নয়। তা যাই হোক উপন্যাসটি শেষ হয় নীলা ও কানাইয়ের পরস্পর প্রেমের স্বীকৃতি ও আদর্শনিষ্ঠ নতুন কর্মজীবনে প্রবেশের ইঙ্গিতে। অনেকসময় উপন্যাসটিকে খন্ড খন্ড ডকুমেন্টারী বলে মনে হয়। লেখক অনেক সময় দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই ডকুমেন্টেশনকে গ্রহণ করেছেন। বিজয় বাবুর নীলাকে প্রেরিত পত্রে ও নীলার সংবাদপত্র পাঠের পরিচয় মেলে।

'গণদেবতা' উপন্যাসের দুটি অংশ 'চণ্ডীমণ্ডপ' এবং 'পঞ্চগ্রাম'। যদিও সম্মিলিত রূপে 'গণদেবতা' নামটিই অধিক প্রচলিত। যদিও এই উপন্যাসে কোথাও দেবতা নেই সবাই রক্তমাংসের মানুষজন। 'গণদেবতা' উপন্যাসে পুঁজিপতি ও শ্রমজীবীর দ্বন্দ্ব নেই, এখানে মূল, দ্বন্দ্ব মহাজন ও খাতক এবং জমিদার ও প্রজাকে নিয়ে। উপন্যাসটি ১৯৪২ সাল নাগাদ লেখা হলেও উপন্যাসটির বর্ণিত সময় হল ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল। এই পুরো সময় জুড়েই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামাঞ্চলের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্বরূপ সামন্ততন্ত্রের ক্ষয় ও ধনতন্ত্রের উত্থানের প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও; এখানে পরিবর্তিত গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতির ছবি, বর্ণভিত্তিক গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় আর্থিক ও দৈহিক শক্তিবলে ক্ষমতার হস্তান্তর, অর্থের গরিমা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বর্ণশ্রেষ্ঠদের লাভজনক নিম্নবৃত্তি গ্রহণ প্রভৃতি বদলে যাওয়া গ্রামীণ সমাজ জীবনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

উপন্যাসে লেখক আমাদের নিয়ে গেছেন শিবপুর ও কালীপুর নামে দুই গ্রামের ভিন্ন অস্তিত্ব মুছিয়ে শিবকালীপুর গ্রামে। গ্রামটি শূদ্র প্রধান গ্রাম, এখানকার জমিদার ব্রাহ্মণ। এই গ্রামে বামুনপাড়া, কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, বাগদিপাড়া, মুচিপাড়া বা বায়েনপাড়া, ছুতোরপাড়া, বাউরিপাড়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে। বোঝাই যায় যে এই গ্রামের পাড়াগুলি প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিভোগী সম্প্রদায়ের নিজস্ব জমিজমাও রয়েছে। জমি থাকলেও দুর্ভোগ এদের নিত্যসঙ্গী। জমিদার, উচ্চবর্ণের ও ধনিকশ্রেণীর নিপীড়ন এদের সহ্য করতেই হয়। তারাশঙ্কর আলোচ্য উপন্যাসে নিম্নবৃত্তিজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক

সংকটের ফলে সৃষ্ট কুলবৃত্তিত্যাগের মতো পরিবর্তিত সময়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই স্বকর্মত্যাগ ও স্বকর্মহীনের পংক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে মুচি বা রুইদাস সম্প্রদায়ের অন্তর্গত গ্রামীণ চর্মব্যবসায়ী ও বাদ্যকর পাতু বায়েন, গিরীশ ছুতোর, তারা নাপিত, চৌকিদার ভূপাল বাগদি, অনিরুদ্ধ কামার, সতীশ বাউড়ি, সর্বস্বান্ত চাষী তারিণী পাল প্রমুখ নিম্নবৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরা।

পূর্বে চণ্ডীমন্ডপকে ঘিরে গ্রামীণ জীবন আবর্তিত হতো, পূজোপার্বণ, আনন্দানুষ্ঠান, উৎসব, বিচারপর্ব - সবকিছুই একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাই চণ্ডীমণ্ডপের নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারোর ছিল না। গ্রামীণ জীবন শক্তির কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত এই চণ্ডীমণ্ডপের আইনের প্রতি মানুষজনের শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় গ্রামকে সংঘবদ্ধ করতো। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিদেশী শাসন ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী প্রভাব গ্রামীণ জীবনের উপর আছড়ে পড়লো। যার ফলস্বরূপ গ্রামীণ জীবনে এযাবত চলে আসা স্থিতিশীলতার শৃঙ্খল ভেঙে পড়লো। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশ্বনাথের কথায় - 'এ যুগের চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না'; তাই তাঁর মতে চণ্ডীমণ্ডপের বদলে সমবায় ব্যাঙ্ক আসা উচিত। একদা এই চণ্ডীমণ্ডপের মালিক ছিলেন জমিদার অথচ সাধারণ মানুষজন এর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ দুই-ই করতো। কিন্তু আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফল চণ্ডীমণ্ডপের মালিকানা ও ক্ষমতা বদলে যাওয়ায় এর মহৎ উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়; তখন এর শাসনকে সকলে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়।

উপন্যাসের সূচনা ঘটেছে, চণ্ডীমণ্ডপের পরিচয় দিয়ে - চণ্ডীমণ্ডপই যেন গ্রাম জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি। অনিরুদ্ধ কামার ও গিরিশ সূত্রধর গ্রামীণ জীবনের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে গ্রামের লোকজনদের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন করেছিল; তারই বিচারের উদ্দেশ্যে চণ্ডীমণ্ডপে মজলিশের আয়োজন করা হয়েছিল। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে খাদ্য বস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া ছিল। গ্রামীণ জীবনে এযাবত চলে আসা বিনিময় প্রথাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী ও গ্রামীণ লোকজনের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকা কষ্টকর ছিল। অনিরুদ্ধ কামারের হাতে তৈরী হাল-লাঙল পরিবর্তে গ্রামীণ মানুষের কাছে কলে তৈরি জিনিসের কদর বেশি ছিল। একারণেই তার জিনিস বিশেষ কেউ নিত না। জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাবেকী দর অনুযায়ী হাল প্রতি দেড়শালি ধানের মজুরি তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। তাছাড়া গ্রামের বহু ঘরেই হাল উঠে যাওয়ার ফলে জীবন ও জীবিকার জন্য অনিরুদ্ধকে ভিন্ন দিক ভাবতে হয়। আবার গিরিশ সূত্রধরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। গ্রামের সব মানুষ আগেকার

মতো তাকে লাঙলের হাতল, গরুর গাড়ির চাকা তৈরি ও ঘরবাড়ির আসবাবপত্র, দরজা-জানালা তৈরির প্রয়োজনে আর ডাকে না; বাজারে সস্তা দেখে জিনিস নিয়ে আসে। তাই তারা দুজনেই পরম্পরাবাহিত গ্রামীণ ব্যবস্থার বিপক্ষে গিয়ে জংশনের বাজারে হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করতে চেয়েছে। কৃষকেরা তাদের এই মানসিক পরিবর্তনকে উদার মনে মেনে নিতে পারেনি। তারা চণ্ডীমণ্ডপের মজলিশ ডেকে এই অবস্থার বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছে। অনিরুদ্ধ কামার চণ্ডীমণ্ডপের ডাককে অস্বীকার করেনি, তবে চণ্ডীমণ্ডপের শাসন ক্ষমতা যখন বিধর্মী, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু লোকের হাতে চলে যায় সে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে; অস্বীকার করেছে চণ্ডীমণ্ডপের আইনকে — "আমরা আর ও কাজ করব না মশায়, জবাব দিলাম। যে মজলিশ ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না"[২২]। অনিরুদ্ধের এই জেহাদের কারণ গ্রামের অসজ্জন ব্যক্তি ছিরু পাল। তার ভয়াবহ অত্যাচারের পরিচয় পাই অনিরুদ্ধের এই সত্যভাষণের পরের দিনটিতে। বিচারের পরের দিনই কারা যেন অনিরুদ্ধের দু'বিঘা জমির কাঁচা ধান কেটে নিয়ে যায়। গ্রামের সমাজ যেহেতু মজলিশের দিনে তাকে একঘরে করেছে; তাই তার এই দুরবস্থায় কারো মাথাব্যথা দেখা যায় না। জমিদারের এই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ালে; জমিদারের বাগান ক্ষতি করার অপরাধে তার দু'বছরের কারাদন্ড হয়। সর্বস্ব হারিয়ে অনিরুদ্ধ তার চারিত্রিক দৃঢ়তা হারায়। জংশনের কারখানায় ফিটারের কাজে যোগ দেয় ও প্রচুর মদ খেতে শুরু করে। তার স্ত্রী পাগল হয়ে যায়, সে ও ভবঘুরে হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চণ্ডীমণ্ডপ তার পূর্বের গুরুত্ব হারিয়েছে, সেখানকার বিধান আর কেউই মানে না। এই চণ্ডীমণ্ডপেই ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি-প্রাইমারী স্কুল বসতো, যার পণ্ডিত আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সদগোপ চাষীর ছেলে দেবনাথ ঘোষ। ক্রমশঃ চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বৈঠকখানার পত্তন হয়েছে। সেই বৈঠকখানাতে বসে গ্রামের মানুষেরা পরাধীন ভারতের সংগ্রাম কংগ্রেসে গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। অথচ দেবু ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপের উত্থানের কামনা করেছে, সে চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় বসে সমগ্রভাবে সাক্ষরতার কথা চিন্তা করে। দেবু ঘোষ জেলে যাওয়ার পর চণ্ডীমণ্ডপের দখল নেয় ছিরু পাল। সে চণ্ডীমণ্ডপকে বাঁধিয়ে সেখানে নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চায়। চণ্ডীমণ্ডপে এখন জমিদারী খাজনা আদায় চলে; সেখানে আর গ্রাম জীবনের সমস্যার সমাধান হয় না।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি শিবকালীপুরের প্রতিটি মানুষই চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। জমি থেকেই এদের সংবৎসরের খোরাক সংগৃহীত হয়। তাছাড়া চাষবাসের ফাঁকে এর পেশাগত ব্যবসাতেও কিছু ধান ও নগদ পয়সা সংগ্রহ করে। এই গ্রামে পাতু বায়েনও তিন বিঘা চাকরান জমি ভোগ করতো তবে তার বদলে সে পালা-পার্বনে ঢোল বাজাতো ও জমিদারী সংক্রান্ত খবরের প্রচার ঢোল বাজিয়ে করতো। তাছাড়াও এতদিন ভাগাড়ের সম্পত্তি বংশপরম্পরায় তারাই ভোগ করতো। তাই দ্বারকা চৌধুরী দাবি করেন গ্রামের ভাগাড়ে মড়া পড়লে যেহেতু মুচিরা চামড়া, হাড় বিক্রি করেন (মাংস নিয়ে যাওয়ার কথাটা ঘৃণাবশে উচ্চারণ করতে পারলেন না) তাই 'আঙোট জুতি' তারা দিতে বাধ্য। কিন্তু ভাগাড় জমিদাররা মুনাফা লাভের আশায় অন্য মুসলমান চামড়া ব্যবসায়ীকে বন্দোবস্ত করে ফেললে; তাদের দীর্ঘকালীন অধিকার হাতছাড়া হয়। পাতু নিজের মুখে এই সংকট সবাইকে জানিয়ে বলে 'আলিপুরের রহমত স্যাখ', 'কঙ্কনার রমন্দ চাটুজ্জের সঙ্গে ভাগাড় দখল করেছে'। আর ভাগাড়ে মড়া পড়লে তাদের মড়া ছাড়াবার জন্য মজুরি হিসেবে নুনের দাম ও বাড়তি দু-চার আনা দেওয়া হয়। তাছাড়াও শর্ত অনুসারে সব চামড়া শুধুমাত্র তাদের কাছেই বিক্রি করতে হয়। তাই মড়া ছাড়িয়ে তাদের ভাগে কিছুই জোটে না। এছাড়া শিবতলা, চণ্ডীতলা, কালীতলা প্রমুখ গ্রামে নগদ অর্থে ঢাক বাজিয়েও তার সংসার চালাতে অসুবিধা হয়েছে। তাই চূড়ান্ত অর্থসংকটে সে অনিরুদ্ধ ও গিরিশের মতো পূর্বপুরুষের ভিটেত্যাগ তথা গ্রামত্যাগ করে কর্মের সন্ধানে শহরমুখী হয়েছে। পরিবারের অন্নচিন্তা তাকে হতচেতন করে তুলেছিল তাই হিতাহিত ভুলে সে বাঁচবার লড়াইয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে বর্ণশ্রেষ্ঠদের লাভজনক নিম্নবৃত্তি গ্রহণের চিত্র রয়েছে। ব্রাহ্মণ রমেন চাটুজ্জেকে তাই সমাজের কটাক্ষ শুনতে হয়। দ্বারকা চৌধুরী বলেছেন — ''শেষে চামড়া বেচিয়া রামেন্দ্র চাটুজ্জে বড়লোক হইবে। ছিঃ ছিঃ ব্রাহ্মণের ছেলে''[২৩]। পাতুর জীবনে শুধু অর্থ সংকট নয় পরিবারের ইজ্জত ও আব্রুর দিকে ভদ্রলোকেদের নজরের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে। উপন্যাসে হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা ছিরু পালের সঙ্গে পাতুর বোন দুর্গাকে নিয়ে গড়ে ওঠা গোপন সম্পর্ক এখানে বাংলার গ্রামজীবনের কদর্য সত্যটি তুলে ধরে।

অনিরুদ্ধ ও গিরিশের দেখাদেখি তারা নাপিতও চুল ছাঁটা বন্ধ করেছে। তার দাবি আগে টাকা ফেল তারপর ক্ষৌরকর্ম কর। তাই সে জংশনে গিয়ে সেলুন খুলেছে। আসলে কঙ্কনার বাবুদের কাছে হাতে কামানো ক্ষুর চলে আসায় তাদের ব্যবসায় সংকট দেখা দেয়। গ্রামের লুটনী দাইও আজ নগদ পয়সার বিনিময়ে দাইগিরি করতে